পুনর্জন্ম?

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ
ভেনারেবল করুণেগোডা পিয়তিস্‌স
নায়ক থের

অনুবাদ : **অধ্যাপক ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া**

বুডি-স্ট রিচার্স এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mottrijagat Bhante

সিরিজ গ্রন্থমালা-১১

পুনর্জন্ম?

[ইংরেজী মূল প্রবন্ধ "REBIRTH" এর বাংলা অনুবাদ]

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ
ভেনারেবল করুণেগোডা পিয়তিস্‌স
নায়ক থের

নিউইয়র্ক বুড্ডিস্ট বিহার
নিউইয়র্ক

অনুবাদ : অধ্যাপক ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া

বুডি-স্ট রিচার্স এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।

পুনর্জন্ম? (REBIRTH?)

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ

ভেনারেবল করুণেগোডা পিয়তিস্‌স নায়ক থের

.....

অনুবাদ

অধ্যাপক ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া

.....

প্রকাশকাল

প্রবারণা পূর্ণিমা ১৪১২

১৬ অক্টোবর ২০০৫

.....

প্রকাশনায়

বুডি-স্ট রিচার্স এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম

.....

প্রকাশক

শ্রী শিমুল বড়ুয়া

নিউইয়র্ক, ইউ.এস.এ

.....

অক্ষর বিন্যাস

সরোজ বড়ুয়া

.....

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

সৈকত বড়ুয়া

শ্রদ্ধাদান : পনের টাকা

উৎসর্গ

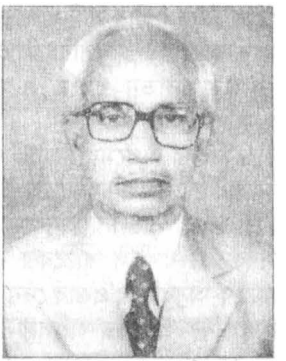

শ্রী নৃপেন্দ্র বিজয় বড়ুয়া

জন্ম : ১৪ পৌষ ১৮৩৭ শকাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ৯ আগস্ট ১৯৮৭ ইংরেজি সোমবার

প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি
পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি (বর্তমান বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি)

সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ

সহ-সভাপতি ও ট্রাষ্ট বোর্ড সদস্য
বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট ফাউণ্ডেশন

ভূমিকা

প্রবীণ নায়ক থের. ভদন্ত করুণেগোডা মহোদয় একজন অনন্যসাধারণ সুপণ্ডিত শীলবান বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাঁর সান্নিধ্যলাভ, আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের বলে মনে করি। তাঁর সুপরিচালিত নিউইয়র্ক বুড্ডিস্ট বিহারে বাঙালি বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সুযোগ-সুবিধা করে আসছেন। এটি বাঙালি বৌদ্ধদের প্রতি এই মহান বৌদ্ধ ভিক্ষুর অপ্রমেয় মৈত্রীর পরিচায়ক।

একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পর্ব শেষে তিনি আমাকে তাঁর সুলিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ "REBIRTH?" এর বাঙলায় অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন। প্রবন্ধটির বক্তব্য সর্বস্তরের বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে অনুবাদের প্রস্তাব দেন বলে আমার ধারণা। পুনর্জন্ম-তত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক প্রবন্ধের বাঙলায় অনুবাদ করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য না হলেও, অতি উৎসাহ ভরে প্রবন্ধটির বাংলায় অনুবাদ করতে প্রয়াসী হই।

মূল প্রবন্ধের তাৎপর্যপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়টি পাঠকের কাছে বোধগম্য হলেই, আমার এই প্রয়াস সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

এই প্রবন্ধের পান্ডুলিপি বাঙলায় কম্পিউটার কম্পোজ করে স্নেহভাজন শিমুল বড়ুয়া একটি কুশল কর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমি তার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

সবাই সুখ শান্তি লাভ করুক, এই কামনায়-

নিউইয়র্ক
এপ্রিল ২১, ২০০৪ খ্রিঃ

অরবিন্দ বড়ুয়া

পুনর্জন্ম

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড্ চার্চ অফ গড' এর প্রতিষ্ঠাতা রেভারেন্ড হারবার্ট্ এইস্ আর্মস্ট্রং ও তাঁর সহকর্মী মিনিস্টার কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্রে উল্লেখ করেছেন, 'শতকরা ৬৩ জন আমেরিকার অধিবাসী 'পুনর্জন্ম'-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন।' এই প্রসঙ্গে আমার ধারণা গত ১৮ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

আমি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলঙ্কা থেকে আমেরিকায় আসি। তখন লক্ষ্য করি, খুবই স্বল্প সংখ্যক আমেরিকার অধিবাসী শ্রীলঙ্কার নাম শুনেছেন। শ্রীলঙ্কার অন্য নাম সিংহলের কথা হয়তো কেউ শুনে থাকবেন, তবে তাও সিংহলের চা-র সুবাদে। আমেরিকার শতকরা ৩ জন মানুষ মানচিত্রে শ্রীলঙ্কার অবস্থান কোথায়, তা জানেন কি না সন্দেহ। মোট কথা, এখানকার অধিবাসীরা আমার স্বদেশ শ্রীলঙ্কা সম্বন্ধে তেমন বিশেষ জানতেন না; যারা জানতেন, তারাও সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। "পুনর্জন্ম"-তত্ত্ব সম্পর্কেও আমেরিকার মানুষের ধারণা অনুরূপ, যদিও এদের অনেকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে বিশ্বাস করেন। সদ্ধর্ম সম্পর্কে জানা না থাকলে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা সম্ভব নয়।

গৌতমের বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে তাঁর পুর্বজন্মের জীবনকাহিনী নিয়ে 'জাতক' কাহিনী রচিত হয়েছিল। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বলেছিলেন এটিই আমাব শেষ জন্ম। ভবিষ্যতে আমার আর কোনও জন্ম হবে না। আয়া মান্তিমা জাতি, নাত্থি দানি পুনভব।" এই উক্তির সাহায্যে বুদ্ধ নিশ্চিতভাবে এই কথা বলেছিলেন যে, তিনি ইতিপূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ "পুনর্জন্ম" আছে। এতে এই সত্যও জানা যায় যে, নির্বাণ লাভের পর আর জন্ম হয় না।

পুনর্জন্ম সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের অভিমত

বুদ্ধধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মেও পুনর্জন্ম সম্পর্কে বিশ্বাস বিদ্যমান। বৈদিক ব্রাহ্মণ ও হিন্দুরা "পুনরুজ্জীবনের" মতবাদে মুসলমানরা "পুনরুত্থানের" মতবাদের মাধ্যমে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বাইবেলে যীশুকে পয়গম্বরের অন্যতম অবতার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (ম্যাথিয়ে ১৩-১৪)। যীশু সিজারিয়া ফিলিপ্পাই জেলায় আগমন করে তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করেন, "মানুষ নিজেকে কার সন্তান বলে মনে করেন?" শিষ্যেরা উত্তর দিলেন, "কেউ জন্ নামে বেপিস্ট, কেউ বলেন, এলিজাহ, কেউ বললেন, জেরিমিহা। কেউ বললেন, পয়গম্বরের একজন।' জন-গ্রন্থ পাঠ করে এর ৪৩-৪৪ পঙতি থেকে জানা যায়, যীশু তখন উচ্চস্বরে বলেছিলেন, 'লাজারাস্ বেরিয়ে এসো।" মৃতব্যক্তিটি বেরিয়ে এলো; তাঁর হাত-পা ব্যান্ডেজে বাঁধা ছিল, তাঁর মুখমন্ডল কাপড়ে ঢাকা ছিল। যীশু শিষ্যদের বললেন, "তাকে বন্ধন মুক্ত করো এবং যেতে দাও।" এই ঘটনা থেকে জানা যায়, মৃত একজন মানুষকে যীশু পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ ও হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, "আত্মার" মধ্য দিয়ে জীবগণ জন্ম থেকে

জন্মান্তরে গমন করে। অক্ষয় আত্মার সূত্রবন্ধনে জীবগণ যুক্ত থাকে। অতীতের ভাল-মন্দ কর্মফলের সাহায্যে পরবর্তী জন্মলাভ হয়। জুইশ, খ্রিস্টান, মুসলমানরা "পুনরুত্থান" তত্ত্বের প্রক্রিয়ায় স্বর্গে বা নরকে স্থায়ী জীবন লাভের মাধ্যমে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। এতে লক্ষ্যণীয়, বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় এই তত্ত্বকে বিশ্বাস করা হয়।

পুনর্জন্ম ও বৌদ্ধ দর্শন

কোনও কোনও বৌদ্ধরা পুনর্জন্মকে "পুনং উদয়", "পুন:জন্মলাভ", অবতারবাদের সংজ্ঞায় আখ্যায়িত করেন। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদর্শনে পুনর্জন্মের মূল সংজ্ঞা হলো "পুনর্ভব"। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সনাতনবাদের প্রভাবে কোনও কোনও বৌদ্ধ পুনর্জন্ম সম্পর্কে ভিন্ন সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। বুদ্ধ বলেছেন, "ঞান তন্হা পুন: ভবিকা"। তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের মূল কারণ।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ, সাধারণ মানুষের কাছে বা অপ্রত্যক্ষ, তা' প্রত্যক্ষ করার, সাধারণ মানুষের কাছে যা' পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তা' পরিমাপ করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনের সাহায্যে বস্তুর বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি অনুভব করি। যেমন চোখ দিয়ে রূপ, কান দিয়ে শব্দ, জিহ্বা দিয়ে রসাস্বাদন, নাক দিয়ে ঘ্রাণ, মনোচেতনার সাহায্যে ধর্মচেতনা মূল্যায়ন করি। বুদ্ধ এগুলোকে জড়-জীব জগতে "উদয়-লয়" এর কার্যকারণ প্রক্রিয়ায় তিনটি সত্যের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই তিনটি সত্য হলো- ১. অনিত্য অর্থাৎ জড়-জীবজগতের সবকিছুই বিরামহীনভাবে পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

২. ঐ পরিবর্তনশীলতার কারণে যেহেতু সব কিছু ক্ষণস্থায়ী, তাই প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয়-যোগ বশত: সবকিছুই দুঃখদায়ক।
৩. অনাত্মা অর্থাৎ ঐ বিরামহীন পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় 'আমি' 'নিজ', 'আত্মা' বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় বিধায় সবই অনাত্মা অর্থাৎ আমিত্বহীন।
পর্যালোচিত প্রথম সত্যের আলোকে জীব ও জড় বস্তুর বিষয় বিশ্লেষণ করা হলে বোঝা যাবে, সবকিছু সদাপরিবর্তন প্রক্রিয়ায় ক্ষণস্থায়ী হয়ে অবস্থান করছে। অনিত্যতা সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা না হলে জীবনের অর্থ কি, মৃত্যু, পুনর্জন্ম কি-এ বিষয়সমূহ বোঝা যাবে না। বর্তমানের এই মুহূর্তে বিশেষ কোনও বস্তু যে আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে অবস্থান করছে, পরমুহূর্তে তার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের কাছে এই পরিবর্তন ধরা পড়ে না। আমাদের ভ্রান্তি হয়। কিন্তু এটিই বাস্তব সত্য: এটিই পুনর্জন্ম। এক টুকরো কাগজ আগুনে রাখলে তা' ভস্মে পরিণত হয়। এখানে কাগজের অস্তিত্ব ভস্মের অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি পুনর্জন্ম। কাগজের এই ভস্মের কারণ আগুন। আমাদের পুনর্জন্মের কারণ 'তৃষ্ণা' বা অনিয়ন্ত্রিত লাগামহীন অসংযত ইন্দ্রিয় ভোগলিপ্সার চাহিদা যা' আমাদের দুঃখের মূল কারণ।
আমাদের মনোচেতনায় একই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। মনের এই মুহূর্তের ভাবনা পর মুহূর্তে অন্য ভাবনা এসে মনকে দখল করে। যেমন একজন ছাত্র তার বাড়িতে সপ্তাহান্তে তার স্কুলের পরের সপ্তাহের কর্মসূচির কথা ভাবতে পারে, এর পর মুহূর্তে তার কোন শিক্ষকের কথা ভাবতে পারে। একটি ভাবনা অন্যটিকে

বিলুপ্ত করে। ভাবনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কযুক্ত। একই প্রক্রিয়ায় পুনর্জন্ম ঘটে। মানুষের মনে ১৭ প্রকারের ভাবনা আছে, যা অবিরাম পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। জীবজগতের পরিবর্তনসমূহ জড়জগতের পরিবর্তনের চাইতে আমাদের কাছে বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। যেমন একজন নবজাত শিশু বড় হয়, কিশোর থেকে যুবক হয়, যুবক প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বার্ধক্য এবং পরিশেষে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু আসে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে সাধারণত: অনেকে বিশ্লেষণ করে ভাবেন না। মৃত্যুর মুহূর্তে যে ভাবনার উদ্রেক হয়, পরবর্তী জন্মকে তা প্রভাবিত করে। অতীতের এবং বর্তমান সময়ের কৃত কুশল-অকুশল কর্মফলাফল পরবর্তী জন্মকে প্রভাবিত করে। মননশক্তির অভাবহেতু অনেকে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না।

সম্প্রতি প্রজন্মের মধ্যে ধর্ম-চিন্তা ও মননশক্তি ক্রমশ: লোপ পাচ্ছে। অন্ধবিশ্বাসে অনেকে মনে করেন, কোনও পরাশক্তি আমাদের সৃষ্টি করেছে। আমাদের ভাল-মন্দ সেই পরাশক্তিই নির্ধারণ করে। সেই শক্তি-ই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। বৌদ্ধদর্শনের অভিধর্মের শিক্ষায় একজন বৌদ্ধকে যুক্তির ভিত্তিতে জড়-জীব জগতের প্রকৃত স্বরূপকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে হবে। মন-ই সবকিছুর চালিকাশক্তি। শুদ্ধ শীলাচারী প্রশিক্ষিত মনের দ্বারা পরিচালিত জীবনাচরণ কুশলদায়ক, যাতে অনুকূলধর্মী পুনর্জন্ম লাভ হয়। পক্ষান্তরে, অশুদ্ধশীলাচারী অশিক্ষিত মনের দ্বারা পরিচালিত জীবনাচরণ, অকুশলদায়ক, যার ফলে প্রতিকূলধর্মী কষ্টদায়ক পুনর্জন্ম হয়।

শান্তিময় পুনর্জন্ম

সৎ কর্ম কিংবা অপকর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরবর্তী পুনর্জীবনের অবস্থা নির্ণীত হয়। আমাদের মনোচেতনা দ্বারা সৎকর্ম বা অপকর্মাদি সংঘটিত হয়। কায়-কর্ম, বাক্য-কর্ম, মনো-কর্ম-এই তিন পন্থায় আমরা কর্ম সম্পাদনা করি। এই কর্ম সম্পাদন যদি ইন্দ্রিয় লিপ্সা জাত লোভ, ক্রোধ ও মোহাচ্ছন্ন হয়, কর্ম অকুশলধর্মী হয়। এই কর্ম সম্পাদন যখন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাধর্মী হয়, তখন কুশলপ্রদ হয়। অকুশল কর্ম ও কর্মকর্তা নিজের এবং অন্যদের ক্ষতির কারক। কুশলকর্ম কর্মকর্তা নিজের ও অন্যদের মঙ্গলদায়ক। কুশলকর্ম সুখদায়ক উন্নত পুনর্জন্মের কারক। অকুশলকর্ম দুঃখদায়ক পুনর্জন্মের কারক। একজন প্রকৃত বৌদ্ধ তাঁর জীবনব্যাপী কুশলকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়ে শান্তিময় পুনর্জন্ম লাভে অগ্রসর হন। এতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মাৎসর্যের ক্রম উপশম হয়। 'কুশল' শব্দটি পালি ভাষায়। কুশলকর্ম বলতে কায়মনোবাক্য দ্বারা সুশীল কর্ম বুঝায়। ত্যাগ ধর্মী কুশলকর্ম অনুশীলনের দ্বারা মনোচেতনা সংযত হয়, ফলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভের ফলে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়। প্রজ্ঞার মনোচেতনায় একাগ্রতা প্রাপ্তি হয়।

কায়কর্মের সাহায্যে তিনটি সুশীল জীবনাচরণ অনুশীলন করতে হবে:

১. কখনো প্রাণী হত্যা করো না।
২. তোমাকে দেয়া হয়নি, এমন কিছু গ্রহণ করো না
৩. যৌনাচারে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হও।

বাক্যকর্ম দ্বারা চারটি সুশীল জীবনাচরণ অনুশীলন করতে হয় :

১. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থেকো।
২. কখনো কর্কশ বাক্য ব্যবহার করো না।

৩. তোমার কোনও কথায় কেউ কষ্ট পেতে পারে, এমন বাক্যালাপ থেকে বিরত থেকো।

৪. বৃথা বাক্যালাপ করো না।

এছাড়া, মনোচেতনা বিভ্রান্ত হতে পারে কিংবা নিষ্ক্রীয় হতে পারে, এই জাতীয় যেকোনও দ্রব্য, ড্রাগ, মদ্য পানাহার থেকে বিরত থেকে মনোকর্মের কুশল কর্মের অনুশীলন অবশ্য করণীয়।

এই আট প্রকার শুদ্ধশীলাচারধর্মী জীবনাচরণ বৌদ্ধিক জীবনাচরণ বলে আখ্যায়িত।

শীল পালন, ধ্যানসমাধি অভ্যাস, সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব মনের একাগ্রতা আনে। এতে দেহ ও মনোগত ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনা জাগ্রত হয়। সচেতন একাগ্রতা জাগ্রত হলে জড়-জীব জগতের যা যেমন, তাকে তেমনিভাবে প্রত্যক্ষ করে এর স্বরূপ জানা যায়। এতে জড়-জীব জগত সম্পর্কিত তিনটি সত্য-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়। প্রজ্ঞা মনোচেতনার একাগ্রতার ফসল। আপনার আনন্দময় অবস্থায় যদি আয়নায় আপনার মুখ দেখেন, তখন দেখতে পাবেন, আপনার মুখমণ্ডল আনন্দদায়ক। আবার ক্রুদ্ধ অবস্থায় যদি আয়নায় মুখ দেখেন, দেখবেন মুখমণ্ডল বিষণ্ন। এইভাবে আয়নায় মুখ দেখে যেমন আপনার ভাল-মন্দের প্রতিচ্ছবির পার্থক্য আপনি বুঝতে পারেন, তেমনি কুশলধর্মী জীবনাচরণ ও অকুশলধর্মী জীবনাচরণের কর্মফলের পার্থক্যও বোঝা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য-ধর্মী জীবনাচরণ অকুশলধর্মী; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা-ধর্মী জীবনাচরণ কুশলধর্মী। কুশলধর্মী জীবনাচরণ উন্নততর শান্তিপ্রদ পুনর্জন্মের এবং অকুশলধর্মী জীবনাচরণ দুঃখপ্রদ পুনর্জন্মের কারক হয়। বস্তুতঃ স্বর্গ-নরক এই জগতেই বিরাজমান। আমাদের দেহ ও মনের মধ্যেই সুখ-দুঃখের উৎস নিহিত।

মৃত্যুর সময় মনে যে ভাবনার উদয় হয়, তা পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ কুশলধর্মী ভাবনা অনুকূল জীবন, অকুশলধর্মী ভাবনা প্রতিকূল জীবনের কারক হিসাবে কাজ করে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় এই সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। যেমন আনন্দদায়ক স্মৃতি রোমন্থনে আমরা আনন্দবোধ করি: নিরানন্দ দুঃখের স্মৃতি রোমন্থনে বিষণ্নবোধ করি।

অশান্তিময় পুনর্জন্ম

আমরা নিজেরাই আমাদের পরবর্তী জীবনাবস্থার জন্য দায়ী। ঈশ্বর, ব্রহ্মা অথবা অন্য কেউ আমাদের ভাল-মন্দ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে না। নিজের কায়-কর্ম, বাক্য-কর্ম, মনোকর্মের ফলাফল আমাদের শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে। অজ্ঞতা, প্রশিক্ষণবিহীন মনোচেতনার ফলে আমরা ভ্রান্ত, অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে নরক যন্ত্রণাময় পরবর্তী জীবন লাভ করি। নরক জীবনের চারটি স্তরের একটি স্তর পশুর জীবনকে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, মানুষের মতো পশুরাও দেখে, শোনে, স্বাদ গ্রহণ করে, ঘ্রাণ পায়, স্পর্শানুভব করে; কিন্তু পশুরা এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি উপভোগ করতে জানে না। পশুরা সূর্যের তাপ, শীতকালের শৈত্য, বর্ষার বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা চায়। কিন্তু মননশীলতার অভাবে নিজের ও জড় জগতের স্বরূপ অনুধাবন করে তার উন্নয়নসাধন করে উপভোগ করতে পারে না। পশুর মতো মানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিসমূহ অনুভব করে; তার মননশীল অনুশীলনের সাহায্যে মানুষ চিত্রাঙ্কন করে, শব্দ দিয়ে সঙ্গীত রচনা করে, নানাবিধ সুঘ্রাণ তৈরি করে, বিভিন্ন খাদ্যসম্ভার তৈরি করে, ভ্রমণের আনন্দ উপভোগের জন্য এবং হাঁটার শ্রম লাঘবের জন্য যানবাহন তৈরি করে। এসবই

মানুষের মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনার ফসল। মানুষের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হলো, জীব-জড় জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা অর্জন। পুনর্জন্মে মানুষ হিসেবে জন্মলাভ করাটাই একজন মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

কর্ম এবং ভবিষ্যত পুনর্জন্ম

বর্তমানে আমরা যে কর্মসম্পাদন করি, তা' ভবিষ্যতে অসংখ্য জন্মের কারক হিসাবে কাজ করে। এই কর্ম আমাদের বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যত জীবন, উভয়কে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই কর্মপ্রভাব সম্বন্ধে আমাদের অনেকের জানা নেই।

মৃত্যুর পরেই সাধারণতঃ কর্মের শুভাশুভ ফল সম্পর্কে জানা যায়। কেউ যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল বা কোনও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর সেই শুভফল প্রজন্মান্তরে শুভফল প্রদান করা যায়। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোনও প্রজাতি বা গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের বিলুপ্তির জন্য দায়ী হয়, তার অশুভ ফল প্রজন্মান্তরে কার্যকর থাকে। এই শুভাশুভ ফল শুধু কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করে না, তা' অন্যদেরও প্রভাবিত করে। অতীতে এবং বর্তমান সময়ে কৃত কর্ম দৈনন্দিন জীবন এবং ভবিষ্যত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কায়কর্ম, বাক্যকর্ম, মনোকর্মের পর্যায়ক্রমিক ফলশ্রুতিতে কর্মপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। এটি একটি বিরামহীন ঘূর্ণায়মান চক্রের মতো। অজ্ঞতার কারণে অনেকে আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারি না। নিজের শুভ-অশুভ কর্মফলের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা হয়, প্রশ্ন করা হয় 'আমার কেন এত কষ্ট?' এতে অন্য এক ভুল হয়; কেননা প্রকৃতপক্ষে 'আমি', 'আমার' বলে কোনও অস্তিত্ব নেই। প্রতি মুহূর্তে 'আমি'র অবিরাম পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

'নিজ' সম্বন্ধে অলীক ধারণা

সহজাত অভ্যাস ও সংস্কার বশত: প্রত্যেক প্রাণীর 'আমি', 'নিজ'-কে নিয়ে আমিত্ববোধ আছে। কিন্তু সব কিছুই সদাপরিবর্তনশীল বিধায় প্রকৃতপক্ষে 'আমি' বা 'নিজ' এর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। আমাদের দেহ বত্রিশ প্রকারের ক্ষয়িষ্ণু উপাদানের সমষ্টি মাত্র। ধ্যান সমাধি অর্জিত প্রজ্ঞার মাধ্যমে এই সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। মনে করুন গাছ কেটে সেই কাঠ দিয়ে চেয়ার বানানো হলে, চেয়ার থেকে বাক্স তৈরি করা হলো বা টেবিল তৈরি করা হলো। একই কাঠের সাহায্যে মনোচেতনা পরিকল্পিত বিভিন্ন বস্তু তৈরি করার মতো মননশীলতার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ হয়ে জীবনাচরণ করি। আয়নায় যখন আমরা নিজের চেহারা দেখি, তা' আমাদের আসল চেহারার প্রতিচ্ছবি মাত্র। প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পায় আমাদের কায়কর্ম, বাক্যকর্ম, মনোকর্মের মূল্যায়নে। আমাদের মননশীল চেতনা-নিয়ন্ত্রিত কর্মদ্বারা আমরা বিরামহীনভাবে আমাদের প্রকৃতি বদল করে যাচ্ছি। পুনর্জন্ম এরই প্রক্রিয়াধীন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী যখন দেহ নিয়ে গবেষণা করেন, তখন বিজ্ঞানী প্রকৃতপক্ষে দেহের মৌলিক উপাদান-মাটি, জল, তাপ, বায়ুর বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে গবেষণায় রত থাকেন। ঐ উপাদান গঠিত তন্তুতে ক্রিয়াশীল আছে মাটির কাঠিন্য, জলের তারল্য, আগুনের তাপমাত্রা এবং বায়ুর বিভিন্ন গ্যাস-এর গতি। দেহস্থ এই উপাদানে গঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পৃথক পৃথক ভেঙে ফেলার পর সেখানে 'আমি' বা 'নিজ' বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। তাই 'আমি', 'আমার' আমিত্বের কল্পনা অজ্ঞতা-উদ্ভুত। জন্ম-মৃত্যুর বিরামহীন ঘূর্ণীচক্রের মধ্যে সংস্কারে মগ্ন হয়ে আমরা আমিত্বের ভ্রান্ত ধারণায় আবদ্ধ হয়ে আছি।

স্রোতাপত্তির মানসিক স্তর

মননশীল চেতনার বিশেষ স্তরে উন্নীত হলে স্রোতাপত্তি স্তর প্রাপ্ত হয়। এই চেতনার স্তরকে মননশীলতার প্রথম মৌলিক স্তর-'স্রোতাপন্ন' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই স্তর প্রাপ্ত হলে আমিত্ব-বন্ধন মুক্ত হয়। আমিত্বের মিথ্যাবন্ধন আমাদের জন্ম-মৃত্যুর বিরামহীন চক্রে আবদ্ধ করে রাখে। মনের এই সম্যকচেতনায় আমিত্ব-বোধ বাসা বাঁধতে পারে না। জড়-জীব জগতের প্রকৃত স্বরূপ-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মার উপলব্ধিতে এই স্তরে পৌছানো যায়। আত্মোপলব্ধিপ্রদ 'বিপশ্যনা' ধ্যান পদ্ধতি স্রোতাপত্তি-স্তর প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে উল্লেখিত মানসিক ভ্রান্তিসমূহের কারণে 'পুনর্জন্ম' সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিতর্ক চলতে পারে। বিভিন্ন ধর্মে পুনর্জন্ম তত্ত্বকে কিঞ্চিত প্রীতিসুলভ পুনুরুজ্জীবন রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা অসংযত তষ্ণার কারণে জন্ম জন্মান্তরে এই জগতেই ব্রহ্মরূপে, স্বর্গীয় সুখী দেবতা রূপে, সুখী-দুঃখী মানুষরূপে নরকযন্ত্রণায়ময় কষ্টকর জীবন যাপন করে থাকি। শুভাশুভ কর্মই এর নিয়ন্ত্রক। বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি, তুমি সবাই নিজ নিজ কর্মাধীন জন্ম-মৃত্যুর সংসারচক্রে দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘুরে চলেছি। এর কারণ সদ্ধর্মের দেশিত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। জীবনের সবই পরিবর্তনশীল,অনিত্য। অকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তু হারিয়ে যায়। প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় যোগের ফল দুঃখ। দুঃখ-সুখের আসক্তি-তৃষ্ণা পুনর্জন্মের কারণ। সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে অমিত্ব বন্ধনমুক্ত অনাত্মার মননশীলতা বোধনে আমি নির্বাণ লাভ করেছি। যে কোন কেউ আমার মত আসক্তি মুক্তির সংযম সাধনায় নির্বাণ লাভ করতে পারে।'

সুধী পাঠক,

আপনি যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোন না কোন, এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবে দেখবেন। চিরাচরিত সংস্কার ও প্রথায় আবদ্ধ না থেকে নূতন মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হোন। আমাদের ক্ষণস্থায়ী এই জীব অচিরেই অবসান ঘটবে। মনুষ্যজীবনে অবিরাম জন্মমৃত্যুর এই সংসার চক্রের আবর্তে পুনর্বার জন্মলাভ আপনার পক্ষে পুনর্বার না-ও হতে পারে। দুর্লভ এই মানব জীবনের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হোন।

জগতের সকল প্রাণী ভালো থাকুক, সুখী হোক।

—○—

[ব্রুনো ডেভিড় ক্যাসোলরী কর্তৃক মূল ইংরেজী প্রবন্ধ সম্পাদিত এবং অধ্যাপক ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া কর্তৃক বাংলা অনুদিত]

এই প্রবন্ধের ইংরেজি প্রকাশনার ধর্মদান, মিসেস শুইনিতা গুণশেখর সেকারা (নিউইয়র্ক, ইউ,এস,এ) শ্রীলঙ্কার কর্তৃক তার প্রয়াত পিতা মাতা মি.কে. এম প্যারেরা ও মিসেস সোমা প্যারেরা (ডিসেম্বর-২০০৩) স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং প্রবন্ধের বাংলা প্রকাশনার ধর্মদান, শ্রী শিমুল বড়ুয়া (নিউইয়র্ক, ইউ,এস,এ) কর্তৃক তার প্রয়াত পিতা মাতা শ্রী নৃপেন্দ্র বিজয় বড়ুয়া ও শ্রীমতি সুপ্রিয়া বড়ুয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত (মার্চ ২০০৫)।

অনুবাদকের পরিচিতি

জন্ম : ৭ অক্টোবর ১৯৩৪
মৃত্যু : ২১ মার্চ ২০০৫

প্রফেসর ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া ছিলেন সকলের নির্ভরতার জায়গা। পেশায় একজন সফল চিকিৎসক হয়েও তিনি ছিলেন সমাজ-রাজনীতি-সচেতন অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমী মানুষ। জাতির রাজনৈতিক সংকটে তিনি ছিলেন রাজপথের একজন নিবেদিত কর্মী ও সংগঠক। তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন মহান ভাষা আন্দোলনে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে, আশির দশকের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এবং সহযোদ্ধা ছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমামের।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডা. অরবিন্দ বড়ুয়ার অর্জন ও অবদান ছিলো অসামান্য। তিনি আজীবন সমাজ ও মানুষের কথা ভেবেছেন এবং দায়বদ্ধও ছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিপোক্রিটাস-এর দেয়া উপদেশাবলী তিনি একজন চিকিৎসক হিসেবে আমরণ অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন।

ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া চিকিৎসক হিসেবে দেশের যেখানেই কাজ করেছেন- তিনি গভীর মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে রোগীর সেবা করেছেন। চিকিৎসা যে মহৎ মানবসেবা এটাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত।

এ মহান চিকিৎসক, মানব দরদী মানুষ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার কোঠের পাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীমন্ত রাম বড়ুয়া এবং মাতা বিমলা রানী বড়ুয়া। সহধর্মিনী রুবী বড়ুয়া, দুই পুত্র তাপস বড়ুয়া ও বনফুল বড়ুয়া এবং একমাত্র কন্যা সোমা বড়ুয়া। তিনি গত ২১ মার্চ আমেরিকার নিউজার্সির ওয়ারেন হাসপাতালে সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ভোগসর্বস্ব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর মত মানব হিতৈষীকে হারানো সত্যিই দুর্ভাগ্যের।

প্রফেসর ডা. অরবিন্দ-র এ মৃত্যুতে এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের একজন দরদী মানুষ ও চিকিৎসককে হারালো।